দৈনিক খবর
তারিখ 04 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩
৫ খবর

...ষ কোথায়?

...ম ফজলুল হক

কি সেই ধারা ধরে এগোতে চাইছেন? বিএনপি যেভাবে ক্ষমতায় গিয়েছে আওয়ামী লীগের পক্ষে কি সেভাবে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভবপর হবে? সেভাবে ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ কি করবে? বিএনপি সরকার কী করতে পারছে?

জামায়াতে ইসলামীর নেতারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের জন্য ক্ষমতাসীন বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সেই সঙ্গে জাসদ (ইনু) দলকে দায়ী করে চলছে।

পাঁচ দলের নেতারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য বিএনপি ও আওয়ামী লীগকে এবং কখনও কখনও জামায়াতে ইসলামীকেও দায়ী করছেন এবং তাদের শুভ বুদ্ধির উদ্রেক ঘটাবার জন্য তৎপরতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের কোনো পরিকল্পনা তাঁরাও প্রকাশ করছেন না। শুধু সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে বৈঠক করে সন্ত্রাস দমনের উপায় বের করা যাবে?

পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের যেসব বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মতে সন্ত্রাস রাজনৈতিক সমস্যা, রাজনীতিবিদদের তা মোকাবিলা করতে হবে, রাজনৈতিক মীমাংসা না হলে এ ব্যাপারে পুলিশের কিছু করার নেই। পুলিশ সূত্রে বলা হচ্ছে যে, পুলিশের কাজ অপরাধ দমন করা, রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা নয়- বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে ব্যাপক সন্ত্রাস চলছে তা রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত, পুলিশ রাজনীতির সামনে অসহায়। পুলিশের কথার সঙ্গে অনেক মন্ত্রীর, কোনো কোনো উপাচার্যের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক নেতার বক্তব্য মিলে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের সমস্যাটি একটি রাজনৈতিক সমস্যা- এ কথাটি কোনো কোনো মহল থেকে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু রাজনীতিটা কি, রাজনৈতিক সমস্যাটির রূপ ও স্বরূপ কেমন, তা কেউ ব্যাখ্যা করছেন না। ভাবখানা এমন যে, কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা বৈঠক করে একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। গত সাত মাসে বৈঠকের ও আপোষ-নিষ্পত্তির অনেক আয়োজন করা হয়েছে। ফলাফল কি হয়েছে? আগামী সাত মাসে এ ব্যাপারে কতটা অগ্রগতি হবে? যে উপাচার্যেরা এবং শিক্ষক নেতারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা বলে অভিহিত করে রাজনৈতিক মীমাংসার দাবি জানান তাঁরা কিন্তু পুলিশকেও নিষ্ক্রিয়তার জন্য অভিযুক্ত করেন এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশের কাছে বার বার আবেদন জানান। আর পুলিশও টহল দেয়, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে, সার্চ করে, মোতায়েন থাকে এবং নানাবিধ কর্তব্য পালন করে। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না।

গত বিশ বছরের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, এমন কয়েকজন প্রাক্তন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে এবং বিবৃতি দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা প্রায় সকলেই এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষক-রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। উপাচার্য হিসেবেও তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে Power-struggle সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে দেখা যায়, তাঁদের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের মূল কারণ : শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি; ডীন, সিন্ডিকেট-সদস্য ইত্যাদি পদে শিক্ষকদের নির্বাচন ও নীল, গোলাপী, সাদা, সবুজ ইত্যাদি দলের মধ্যে দলাদলি, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন; পদ পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ ইত্যাদি। এই প্রাক্তন উপাচার্যদের পর্যবেক্ষণে কিছু সত্য আছে, তবে তার জ্ঞানগত পরিমাণ খুব বেশি নয়। তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন থাকাকালে যেসব কর্ম করে গেছেন, তারই ফল কি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজ বহুলাংশে দেখা যাচ্ছে না? সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র তাঁদেরকে যে পরিমাণে দিয়েছে, অথবা সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র থেকে তাঁরা যে পরিমাণে নিয়েছেন, সেই তুলনায় তাঁরা প্রতিদান কতখানি দিয়েছেন? আত্মসমালোচনার দরকার আছে। ১৯৭৩ সালের আইন তাঁরা পছন্দ করেন না, ভালো কথা। এই আইন চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খারাপ হয়েছে, সুতরাং তারা এর বিরুদ্ধে বলতেই পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো কি ধরনের আইন তাঁরা পছন্দ করেন? তাঁরা কি আসলে আইয়ুব খানের প্রচলিত আইনেরই পক্ষপাতি নন? আইয়ুব খানের আইন আজ পর্যন্ত চালু থাকলে কি বিশ্ববিদ্যালয় ভালো চলত? সম্মানিত প্রাক্তন উপাচার্যগণ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাটা দেখেন- রাষ্ট্রের, জাতির, সমাজের সামগ্রিক অবস্থাটা দেখেন না। তাঁরা বুঝতেই পারেন না যে, মধ্যযুগের সামন্তপতিদের মতো ক্ষমতা উপাচার্যগণ এবং বিভাগীয় প্রধানগণ আর কখনো ফিরে পাবেন না, পাওয়া উচিত নয়। শিক্ষকদের পদোন্নতি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অধঃপতন ঘটিয়েছে? শিক্ষকদেরকে যদি অবমাননাকর অবস্থায় রাখা হয়, আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে রাখা হয়, দাসত্বমূলক সম্পর্কের মধ্যে রাখা হয়, তাহলে শিক্ষার অবস্থা উন্নত হবে? কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সমাজে ন্যায়বিচার, ইনসাফ, Justice সম্পর্কে কিছু নতুন ধারণা গড়ে ওঠে। কালের একটা ব্যবধানে গিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজকে সেসব নতুন ধারণার স্বীকৃতি দিতে হয়। যদি সেই নতুন ধারণাকে রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেয়া না হয়, তাহলে গোটা ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশের হয়েছে সেই দশা। আইয়ুব আমলের ব্যবস্থায় ফিরে গিয়ে কিংবা মধ্যযুগীয় মানসিকতার পুনঃপ্রবর্তন দ্বারা শিক্ষার অবস্থা উন্নত করা যাবে- এ ধারণা অবান্তর। শিক্ষাব্যবস্থা ধসে পড়ার এবং শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসীদের কবলে যাওয়ার অনেক কারণ আছে। সেগুলো বিবেচনায় না ধরে কেবল শিক্ষকদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করলে তার দ্বারা কোনো সুফল হবে না। শিক্ষকদের ত্রুটি আছে, তবে শিক্ষকদের অনেক সমস্যাও আছে। প্রাক্তন উপাচার্যদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। আইনস্টাইন লিখেছেন : Numerous are the academic Chairs, but rare are wise and noble teachers. Numerous and large are the lecture halls, but for from numerous the young people who genuinely thirst for truth and justice. Numerous are the wares that nature produces by dozens, but her choice products are few. we all know that; so why complain? was it not always thus and will it not always thus remain? আইনস্টাইন Wise and noble teachers এবং young people who genuinely thirst for truth and justice বলে যাঁদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন, আমাদের প্রাক্তন উপাচার্যদের দৃষ্টিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের কোনো স্থান কি আছে? তাঁরা কি একটি নিয়ন্ত্রণমূলক, নির্যাতনমূলক, প্রতিভা-বিকাশের পরিপন্থী যান্ত্রিক ব্যবস্থার কথাই ভাবেন না? প্রভুত্ববাদী [illegible] ভাবনা দ্বারা তাঁদের মন [illegible] কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির সহযোগী হিসেবে তাঁরা চিন্তা করেন, কাজ করেন- তার বাইরে বেরুবার সামর্থ্য তাঁদের নেই।

জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার কথা আজকাল খুব উচ্চারিত হয়। রাষ্ট্রীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক জীবনধারা যেভাবে চলছে, তাতে কে কার কাছে জবাবদিহি করবে? কর্তৃপক্ষের লোকেরা যদি কর্মীপক্ষের লোকদের চেয়ে যোগ্যতায়, জ্ঞানে, নৈপুণ্যে, চরিত্রবলে উন্নত হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মীপক্ষ কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহির দায় কবুল করে। সে অবস্থায় কর্তৃপক্ষ কর্মীপক্ষকে বাধ্য করতে পারে জবাবদানে। কিন্তু যেখানে নিম্নযোগ্যতার, স্বল্প নৈপুণ্যের, কম অভিজ্ঞতার, নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকেরা নানা ষড়যন্ত্র ও জবরদস্তির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের আসন দখল করে থাকে, সেখানে অরাজকতার স্থানে জবাবদিহির ব্যবস্থা কিভাবে দেখা দেবে? দেশে কোনো সুস্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সরকারপদ্ধতি ও প্রশাসন ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় এখানে সুস্থ জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেওয়াই কি কল্যাণকর হবে না?

সংবাদপত্রে এবং রঙিন সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে আজকাল সন্ত্রাস নিয়ে এত লেখালেখি হচ্ছে যে, অন্য কোন বিষয়ই এত গুরুত্ব পাচ্ছে না। কারো কারো লেখায় গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার প্রকাশ আছে। কিন্তু সেগুলো কোনো কার্যকারিতা পাচ্ছে না, অবহেলিত থাকছে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অবক্ষয় বৃদ্ধির সহায়ক অনেক লেখাও পত্র-পত্রিকায়- বিশেষ করে রঙিন সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হচ্ছে।

সকল মহলের সমালোচনা করে আমি এসব কথা লিখছি তার কারণ, বিচার-বিবেচনায় অগ্রসর হলে দেখা যাবে- যাঁদের কথা এখানে উল্লেখ করছি সন্ত্রাসের জন্য তাঁরা সকলেই কম-বেশী দায়ী। তাঁদের সমকক্ষ এবং তাঁদের চেয়ে অধিক দায়ী আরও কিছু গোষ্ঠী আছে। যেমন ধনিক গোষ্ঠী, এনজিও গোষ্ঠী এবং নয়া উপনিবেশবাদী মহল। যাঁরা সন্ত্রাস ও অবক্ষয়ের জন্য দায়ী তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা সন্ত্রাসের অবসান চান- সুস্থতা চান। তাছাড়া সন্ত্রাসীদের মধ্যেও এমন অনেকে আছে যারা পুনর্বাসন আশা করে।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮০-র দশকের প্রায় শেষ দিক পর্যন্ত 'দুর্নীতি' ছিল সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার বিষয়। এখন যেমন সন্ত্রাসের সংবাদে পত্রিকা ভর্তি থাকে, পূর্ববর্তী বছরগুলোতে দুর্নীতির সংবাদে তেমনি পত্রিকা ভর্তি থাকতো। আমাদের বোঝা দরকার যে, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। দুর্নীতি হল নিরস্ত্র সন্ত্রাস, আর সন্ত্রাস হল সশস্ত্র দুর্নীতি। একই কাজ, যখন অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে, রক্তপাত ঘটিয়ে, জনসমক্ষে সকলকে সন্ত্রস্ত করে প্রকাশ্যে করা হয় তখন আমরা তার নাম দেই সন্ত্রাস; আর যখন তা একটু রেখে-ঢেকে, অন্যায় ও অনুচিত বিধি-বিধান প্রবর্তন করে কিংবা ধূর্ততা, চতুরতা, ভীওতা, প্রতারণা, কারচুপি, দলাদলি ও চাপ সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে করা হয়, তখন আমরা তার নাম দেই দুর্নীতি। যাকে আজ আমরা সন্ত্রাস বলছি, তা আসলে আগে আমরা যাকে দুর্নীতি বলতাম তারই সম্প্রসারণ। যদি এই সন্ত্রাসের ধারা আরও বিকশিত হয়, গণআন্দোলনে বিবেক ও যুক্তির [illegible] হয় তাহলে এই সন্ত্রাস বড় আকারের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লুটতরাজের রূপ নেবে।

এই সন্ত্রাস সম্পর্কে আমাদের সমাজের Dicision-MaKer ও activist-রা কি ভাবছেন তার একটা সারসংক্ষেপ এই আলোচনায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এসবের মধ্যদিয়ে কি মুক্তির কোনো উপায় পাওয়া যায়? ম্যালথাস জনসংখ্যা সমস্যার যে প্রাকৃতিক প্রতিবিধান দেখিয়েছিলেন আমরা কি সেই প্রাকৃতিক প্রতিবিধানের মধ্যদিয়েই চলছি না? আমাদের ভবিষ্যৎ কি? রাষ্ট্রীয় ভাঙাগড়া ও তাকে কেন্দ্র করে ক্ষয়ক্ষতিকে আমি এখন আর খুব বড় ব্যাপার মনে করি না। আমার প্রশ্ন মানুষকে নিয়ে। যে মানুষদের নিয়ে এই জাতি গঠিত, দশ-বিশ বছর গেলে সেই মানুষদের কি হবে?